দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 31 JUL 199…
পৃষ্ঠা … কলাম …

053

শিক্ষাঙ্গন

নিরক্ষরতা দূরীকরণে মসজিদের ভূমিকা

বিগত ১০ জুলাই দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত কাজী আবু হুরায়রার লেখা প্রবন্ধটি খুবই যুক্তিযুক্ত ও সময়োপযোগী হয়েছে। এ কারণে আমি আমার লেখাটাকে সংক্ষেপ করে তারই সমর্থনে দু'টি কথা বলছি।

মিঃ ডব্লিউ, ডব্লিউ হান্টার সাহেব 'আমাদের ভারতীয় মুসলমান' নামক তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন— 'বৃটিশ পূর্ব যুগে বাংলার কোন মুসলমান মূর্খও ছিল না এবং দরিদ্রও ছিল না'। বস্তুতঃ যে সমাজে ইসলামী শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থা চালু থাকবে, সে সমাজে মূর্খতা, নিরক্ষরতা, চরিত্রহীনতা ও দারিদ্র্যতা থাকবে না ও থাকতেও পারে না। এটাই তো ইসলামের বৈশিষ্ট্য। আর এ কারণেই বৃটিশ পূর্বযুগে বাংলাদেশের কোন মুসলমান মূর্খ, চরিত্রহীন, নিরক্ষর বা দরিদ্র ছিল না। তৎকালে নবীয়ে করীম (সঃ)-এর প্রদর্শিত পথে বাংলাদেশের শিক্ষা ও সমাজ তথা তাহজীব তামাদ্দুন সবই পরিচালিত হত মসজিদ থেকে। তখন শুধু এক বাংলাদেশেই মাধ্যমিক পর্যায়ের মাদ্রাসা ছিল আশি হাজার। আর এগুলো সবই পরিচালিত হয়েছে মসজিদ থেকে। এছাড়া উচ্চ শিক্ষার জন্যও বহু প্রতিষ্ঠান ছিল। মসজিদের ইমামগণ ধর্মীয় দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং পরকালের মুক্তির আশায় অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেছেন। জ্ঞান, শিক্ষাদান, চরিত্র গঠন, ও ধ্যান-ধারণার লালন সবই তাঁদের উপর ন্যস্ত ছিল। তারই সুফল ছিল যে, বাংলার কোন মুসলমান মূর্খ বা চরিত্রহীন ছিল না। সমাজে নারী ধর্ষণ, হাইজ্যাক, লুটতরাজ, বেহায়াপনা, বেলেল্লাপনা ইত্যাদির কোন বালাই ছিল না। ঠিক তেমনিভাবে শিক্ষাকে জীবন ধারণের উপায় ও অবলম্বন হিসাবেও কেউ বিবেচনা করেনি। এ কারণে শিক্ষা লাভের পরপরই তারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি শিল্প-কারিগরিতে আত্মনিয়োগ করে আত্মনির্ভরশীল হয়েছে।

পরনির্ভরশীল হয়নি বা বেকারত্বের গ্লানিও তারা ভোগ করেনি। বাংলাদেশ শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প, কারিগরি, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রেই বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের অন্যতম ছিল। তখন বাংলাদেশ 'সোনার বাংলা' নামে আখ্যায়িত ছিল। সেই সোনার বাংলার লোক আজ যেমন নিরক্ষর, মূর্খ, চরিত্রহীন, ঠিক তেমনিভাবে দরিদ্রও। বৃটিশ সরকার শুধু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাই ধ্বংস করেনি উপরন্তু আমাদের ধ্যান-ধারণা, চরিত্র-আখলাক, তাহজীব-তামাদ্দুন ও সমাজ ব্যবস্থা সবই ধ্বংস করে দিয়ে গেছে এবং তদস্থলে যে শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে গেছে, তাতে এ সমাজ কোনদিন নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্যতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে না। কারণ, পাশ্চাত্য জগৎ হচ্ছে ধর্মবিমুখ। আর প্রাচ্যজগৎ হচ্ছে ধর্মভীরু। কাজেই এ দেশের ধর্মভীরু মুসলমানগণকে ধর্মহীন শিক্ষা দ্বারা কখনই উন্নত করা যাবে না।

এরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে কোটি কোটি টাকার জাতীয় বাজেট, লাখ লাখ লোক এবং হাজার হাজার স্কুল-কলেজ, ইউনিভার্সিটি, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে তার সুফল হচ্ছে শতকরা ১৯ জন শিক্ষিত। এটা কি অপচয় নয়? জাতিকে ধ্বংস করা নয়? অপরদিকে জাতীয় বাজেটে যার জন্য এক কর্পদকও বরাদ্দ করা হয় না, শুধু জনগণের অনুদানে পরিচালিত মসজিদ ও মাদ্রাসার মাধ্যমে প্রদত্ত শিক্ষা তথা ধর্মীয় শিক্ষার হার কমপক্ষে হলেও শতকরা সত্তর। অতএব, ধর্মভীরু মুসলমানদের সমাজে সুশিক্ষা বিস্তার, সুনাগরিক সৃষ্টি এবং সুখী সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে রসূল (সঃ) প্রদর্শিত পথ তথা মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষা ও সমাজ গঠনের বাস্তবতা স্বীকার করে সরকার ও জনগণকে এদিকে এগিয়ে আসা উচিত।

এতে স্বল্প সময়ে এ দেশ একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী সমাজ হিসেবে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হবে— তা আমরা নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি ইনশাল্লাহ। এতে প্রয়োজন হবে ইমামগণকে শিক্ষক প্রশিক্ষণদানের, তাদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এবং আর্থিক সহযোগিতা দানের। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, শিক্ষক প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থাটিও ইসলামী হতে হবে। দেশে প্রচলিত পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণাভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নয়। ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শক্রমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে।

—শেখ মুঃ আবদুল জব্বার জাহানাবাদী